

প্রস্তাবিত মডেল স্কুল এবং কংক্রিটের শিক্ষাদর্শন



দেশের বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোর মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে মনোনিবেশ করা অধিক যুক্তিসংগত

নাসিম সামাদানী

প্রকাশ: ১৩ জুলাই ২০২৬ | ২০:৩৪



ক্যাডেট কলেজের আদলে দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৬০০টি ‘মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে সরকার। প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬৮ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এটিসহ বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে যাচ্ছে। প্রস্তাবনাটি শিগগিরই অনুমোদিত হয়ে যাবে, সংশ্লিষ্টরা এমনটাই প্রত্যাশা করছেন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রকল্পটি চমকপ্রদ মনে হলেও এটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার আগে সমাজতাত্ত্বিক এবং তুলনামূলক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। বিএনপি সরকার ইতোমধ্যে তাদের প্রথম বাজেট পাস

করেছে। প্রশংসনীয় ব্যাপার হলো, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে সেই অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে কীরূপ গুণগত পরিবর্তন আনবে, তার পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি।

যে কোনো সমাজে বৈষম্য কমছে কিনা, তা নির্ভর করে সামাজিক সচলতা বা সোশ্যাল মোবিলিটির ওপর। বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সমীকরণ অত্যন্ত জটিল। যেন অনৈতিক পন্থা অবলম্বন ছাড়া সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলা বেশ দুর্লভ। সম্পদের অসমবণ্টন সরাসরি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। দেশে এমন অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেগুলোর ব্যয়ভার বহন করা সিংহভাগ পরিবারের পক্ষেই অসম্ভব। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য যত বেশি, উন্নত শিক্ষার সুযোগও তত বেশি। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার বাজার উন্মুক্ত থাকলেও প্রতিযোগিতাটি শুরু থেকেই অসম হয়ে পড়ে। অনেকেই হয়তো কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই দুঃস্বপ্ন ভেঙে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু এই ব্যক্তিগত লড়াই সেই শিশুটির সমতুল্য নয়, যে জন্মগতভাবেই সমস্ত সুবিধা নিয়ে বড় হচ্ছে।

সমতাভিত্তিক সমাজ বলতে এমন একটি সমাজকাঠামোকে বোঝায়, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ পাবে। ধনীর সন্তান যে বিদ্যালয়ে যাবে, দরিদ্রের সন্তানও একই বিদ্যালয়ে পড়বে। এটি স্রেফ আবেগিক সিদ্ধান্ত নয়; কারণ এরূপ সমতা শিশুর সাংস্কৃতিক পুঁজি বা ‘কালচারাল ক্যাপিটাল’কে প্রভাবিত করে।

ইদানীং করপোরেট নিয়োগকর্তাদের একটি সাধারণ অভিযোগ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী ভালো সিভিও বানাতে পারে না। অভিযোগটি অনেক ক্ষেত্রে অমূলকও নয়। নিয়োগকর্তারা স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে দক্ষ মানুষটিকে চাকরি দিতে চাইবেন। কিন্তু ওই কাক্ষিত অবস্থানে পৌঁছানোর পথটি অনেকের জন্য কতটা অসম ও কণ্টকাকীর্ণ, সেটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিবেচনার বাইরেই থাকে। এমনকি পরিহাসের ব্যাপার হলো, যেসব সংস্থা বৈষম্য নিয়ে কাজ করে, তারাও এই বৈষম্যের বাইরে বেরোতে পারে না।

সমবয়সী দুজন শিশুর কথা ধরা যাক। অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুটি যখন আর্ট গ্যালারিতে যাচ্ছে, বই উপহার পাচ্ছে, নেটফ্লিক্স দেখছে কিংবা বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে, দরিদ্র পরিবারের শিশুটি এসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে এই ব্যবধান বাড়তে থাকে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুটি হয়তো নিজের মেধার জোরে একসময় উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করে, অদেখা পৃথিবীকে চিনতে শুরু করে। কিন্তু ততদিনে দুজনের ব্যবধান আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। কারণ সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুটিও উচ্চশিক্ষায় ঢুকেছে, আর সে খুব ভালো করেই জানে কোথায় ইন্টার্নশিপ করতে হবে কিংবা কীভাবে ভালো সিভি তৈরি করতে হবে। স্নাতক শেষে এই দুজন শিক্ষার্থী যদি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেয়, স্বভাবতই নিয়োগকর্তারা সেই প্রার্থীকে বেছে নেবেন, যার দক্ষতা এবং বৈশ্বিক জানাশোনা বেশি। এখানে দায় ওই আন্তর্জাতিক সংস্থার নয়, এমনকি পরিবারগুলোরও নয়। এই কাঠামোগত অসমতার দায় রাষ্ট্রেরই।

যাহোক, প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধিকাংশ অর্থই ব্যয় হবে জমি অধিগ্রহণে এবং ভবন নির্মাণে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে দৃশ্যমান উন্নয়ন করা সম্ভব। অন্যদিকে বিদ্যমান স্কুলগুলোর মানোন্নয়ন বা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করলে রাতারাতি বিশাল কোনো ভবন দৃশ্যমান হয় না, উদ্বোধনের ফলকও উন্মোচন করা যায় না। এই ‘কংক্রিট-নির্ভর’ উন্নয়ন মূলত একটি বিভ্রান্তিমূলক ও অ-টেকসই ব্যবস্থা, যা প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করে।

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘মডেল’ বা আদর্শ বলার অর্থ কি এই যে, দেশের বাকি স্কুলগুলোকেও ভবিষ্যতে সমান অর্থ ব্যয় করে এ রকম মডেলে রূপান্তর করা হবে? বাস্তবে সেটি একেবারেই অসম্ভব। দেশের অনেক বিদ্যালয়ে যখন পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, শিক্ষার্থীরা যখন বাংলায় সাবলীলভাবে পড়তেই সংগ্রাম করছে, সেখানে নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উন্নত এআই ল্যাব নির্মাণের আগে প্রান্তিক বিদ্যালয়গুলোর মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে মনোনিবেশ করা অধিক যুক্তিসংগত।

আশঙ্কা জাগে, রাষ্ট্রের অর্থে নির্মিত এই ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্সগুলো’ও শেষ পর্যন্ত নামিদামি বেসরকারি স্কুলগুলোর মতো এক্সক্লুসিভ ছিটমহলে পরিণত হবে, যেখানে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে না। যারা এই বিশেষ ব্যবস্থায় ঢোকান সুযোগ পাবে, তারা যদি দরিদ্র পরিবারেরও হয়, তারা সমাজে একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি করবে। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বোর্দিউ তাঁর ‘কালচারাল ক্যাপিটাল’ বা সাংস্কৃতিক পুঁজির তত্ত্বে দেখিয়েছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই তথাকথিত ‘মেধাভিত্তিক’ বাছাই প্রক্রিয়া কীভাবে মূলত কাঠামোগত অসমতাকেই টিকিয়ে রাখে। ফলে প্রান্তিক শ্রেণির অজস্র শিশু মেধা থাকা সত্ত্বেও কেবল সাংস্কৃতিক পুঁজির অভাবে এই প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়বে। রাষ্ট্র এভাবেই ‘মেধার’ মোড়কে শ্রেণিবৈষম্যকে বৈধতা দেয়।

সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথায় এই স্কুলগুলো হবে, তার কোনো বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা হয়নি। ৩০০টি সংসদীয় আসনে সমানভাবে এগুলো ভাগ করে দেওয়ার পরিকল্পনাকে তাই কোনো অবস্থাতেই শিক্ষাতাত্ত্বিক বলা যায় না, এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক মডেল। শিক্ষাবিদদের মতামত কিংবা দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ছাড়া এ ধরনের ‘টপ-ডাউন’ বা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত প্রায়ই শ্বেতহস্তীতে পরিণত হয়।

তুলনামূলক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, ‘ট্র্যাকিং’ বা শিক্ষার্থীদের আলাদা করে এলিট স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা শিক্ষার জন্য আত্মঘাতী। বৈশ্বিক শিক্ষার মানদণ্ডে সফল উদাহরণ ফিনল্যান্ড। ১৯৭০-এর দশকে ফিনল্যান্ড যখন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে, তখন তারা কোনো ‘মডেল স্কুল’ বা ‘এলিট স্কুল’ বানায়নি। তারা ‘পেরফেক্টড’ বা সমন্বিত স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলকে সমান মানে উন্নীত করার নীতি নিয়েছিল। তাদের শিক্ষাদর্শনের মূল কথা এক্সিলেন্স বা উৎকর্ষ নয়, বরং ইকুইটি বা সমতা। সমতা থাকলে উৎকর্ষ এমনিতেই আসে।

সরকার যদি ৬০০টি ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ তৈরি করে, তবে দেশের বাকি ১৯ হাজার সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কি ‘সেন্টার অব নেগলেস্ট’ হিসেবে থেকে যাবে? একটি রাষ্ট্র কি এভাবে ‘মডেল’ বিদ্যালয় বা ‘মডেল’ শিক্ষার্থী দিয়ে

এগোতে পারে? আমাদের প্রয়োজন এমন একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা, যা প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মানবিক এবং চিন্তাশীল হয়ে ওঠার সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

সুতরাং আমরা ‘কী’ করছি, সেটি নিয়ে অস্থিরতার চেয়ে ‘কেন’ করছি, তা অনুধাবন করা বেশি জরুরি। আমাদের একটি পরিষ্কার শিক্ষাদর্শন প্রয়োজন। মেগা-প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, ন্যায্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি।

নাঈম সামদানী: উন্নয়নকর্মী ও শিক্ষা গবেষক

contact@nayeemverse.com